শ্রীচৈতন্যজীবনী কাব্য অবলম্বনে মাধুর্যের উপযোগ

তন্বী মুখোপাধ্যায়, *সহযোগী অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বাংলা, বেথুন কলেজ, কোলকাতা*

সারমর্ম :-

মহামানবেরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণও সংস্কৃতিকে পূর্ণ বিকশিত করতে। যে সমাজ এইভাবে ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধন লাভ করে সেই সমাজই সুন্দর। শ্রীচৈতন্যও আবির্ভূত হয়েছিলেন মানবের সুপ্রবৃত্তির কৃষ্টি প্রকাশ করার জন্য। অধ্যাত্মপথেও তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন প্রেমভক্তি আনন্দ ও মাধুর্যকে এবং অস্বীকার করেছিলেন শক্তি ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রভুত্বপরায়ণতাকে। নিম্নস্তরীয় ব্রাত্যজনকে হীনমন্যতা দূর করার সহজ পথ দেখালেন। উচ্চস্তরীয়কে দম্ভ দূর করে অশক্তের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা জাগালেন। সাম্য ও ঐক্যের অন্তর্নিহিত মাধুর্য প্রকট করাই তাঁর দিব্যজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুচর পরিকরবৃন্দের তৎকালীন মাধুর্যভাববিলাস বর্তমানেও নিরাশ্রয় মানুষের জীবনে নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে।

মূল শব্দগুচ্ছ — শ্রীচৈতন্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, ভাব, দাস্য, আনন্দ, সন্ন্যাস, মানবধর্ম।

মানুষ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে, অনেকাংশে পেরেছে। এ সত্ত্বেও পূর্ণ পরম শেষ বা চরম আদর্শকে মানুষ অন্তহীন বলেই অনুভব করেছে। তৎসত্ত্বেও এই পূর্ণসত্যকে লক্ষ্য করে এগোতেও মানবজগৎ ক্লান্ত হয় নি। তার ক্ষুদ্রসত্যের ধর্মচেতনা দিয়েই সে বৃহত্তর সত্যের স্বরূপ অনুভব করেছে। নিজের মধ্যে আনন্দ ও আত্মবিস্তারের প্রতি দুর্মর আকর্ষণ লক্ষ করে এই মানুষজন বুঝতে পারে বৃহৎ জগতের সকলের মধ্যে মহাজাগতিক এক সামঞ্জস্যসূত্র বিদ্যমান। সব নর্ম কর্ম তার বহুজনের হিত ও সুখ সম্পাদন করতে পারলে আর কিছু চায় না। সে পশুই হোক, তবুও তার মধ্যেই আছে সুমঙ্গলের প্রস্তাব।

চৈতন্যের মাধুর্যের প্রথম কথাই কৃষ্ণভজনা — কৃষ্ণই ভগবান। অন্য ভগবানের মধ্যে তিনিই প্রধান ও অর্চনীয় কেননা 'তিনি' 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'। কৃষ্ণ ভগবানের ঐশ্বর্য গুণকে শ্রীচৈতন্য আবৃত করলেন সন্তর্পণে। প্রকট করলেন মাধুর্যগুণকে। কণামাত্র শক্তি ধরে যে মানুষ সে এই মধুর অনুভবের মধ্যে অবগাহন করবে। মনন ও ভাবজগৎ জাগ্রত করে তুললেন অভাবনীয় মাধুর্যশক্তিকে আপামরের অনুভবশক্তির গোচরে এনে। শ্রীচৈতন্য তাই তিনি 'যার পদছায়ে জীব সুখে বাস করু'। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যের জীবন নিয়ে কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থদুটিতে সঠিক মাধুর্যের গণমনোমোহনের শক্তি বিবৃত হয়েছে।

ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতপরিক্রমা' — গ্রন্থের কৃষ্ণবিষয়ক অধ্যায়ে কৃষ্ণের যোগগুরু হবার সর্ববিধ কারণকে সংক্ষেপে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "... গেল তাঁর শৈশব, আসিল তাঁর তারুণ্য। তখন রাজ্যে দায়িত্বপূর্ণ সাধনার ও ব্রজভূমির প্রেমলীলার মধ্যে করিলেন তিনি যোগস্থাপন। তাহার পরেও দেখা গেল তাঁহার তপস্যা ও প্রেমের মধ্যে যোগসাধনা। মহাপুরুষ ছাড়া কে এই দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারে ?

মহাভারতে তিনি কর্মময়, গীতায় তিনি জ্ঞানময়, ভাগবতে তিনি প্রেমময়। এই তো যুক্ত-ত্রিবেণী। - - - -

চারিদিকে চলিয়াছে যুদ্ধ, মনে হইতেছে জীবন ক্ষণভঙ্গুর। সেই যুদ্ধস্থলের মধ্যে বসিয়া তিনি দিলেন অনন্ত জ্ঞানের দৃষ্টি খুলিয়া,দেখাইলেন অসীম এই জীবন। ..."

শ্রীচৈতন্য কিন্তু আরো বিশেষ অভিপ্রায় থেকে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবিগ্রহকেই আলোকিত করলেন। সেখানে জ্ঞান নয়। জ্ঞান গোষ্ঠীস্বার্থে কেন্দ্রীভূত হয়, দর্পের হ্রাস হয় না জ্ঞান সঞ্চয়ে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে ছদ্মবেশে কচকে আসতে হয়েছিল মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য। কর্মও অন্তরকে সরস করতে পারে নি, লোকাচার কর্মের রকমফের ঘটায়। শেষপর্যন্ত নিষ্কাম কর্মের নির্দেশ দিতে হয়েছে। কর্মের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণ বহুপূর্ব থেকেই নিজস্ব পারিবারিক ও সামাজিক অভ্যাসমত নিয়োজিত। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল নীতি, যুক্তি ও ধর্ম পুস্তকে প্রশ্ন তুলেছেন :-

"... যা হৃদয়ের দ্বারা অনুজ্ঞাত তাই আত্মার প্রিয়। অবশ্য এই মতবাদ সর্বাংশে দোষমুক্ত হতে পারে না। প্রশ্ন থেকেই যায় কোনটি হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির দ্বারা অনুজ্ঞাত আর কোনটি সুপ্রবৃত্তির দ্বারা অনুজ্ঞাত।" (ধর্মস্য তত্ত্বম্)

অতএব ভক্তিযোগ। প্রথমাবধি হৃদয়ের নির্দেশকেই কুণ্ঠাহীন অনুমোদন দিতে পারে ভক্তি। চৈতন্য এই ভক্তিকে প্রেমভক্তিতে রূপান্তরিত করলেন। তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করালেন। ইনিই, মাধুর্যময় চৈতন্য অভীপ্সিত ভগবান।

"বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরু বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্ন সিংহাসনে ।।
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য প্রকাশি করেন জগৎমোহন'।।[১]

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা ৫ম পরিচ্ছেদ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষ্ণবপদাবলী (চয়ন)-বইটির চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা থেকে সংক্ষেপে তাত্ত্বিক রূপরেখা দেওয়া হল। শ্যামাপদ চক্রবর্তী এই প্রবন্ধের লেখক। - "স্বত-উৎসারিত প্রেমে সহজচ্ছন্দে কৃষ্ণভজনের জন্য গোপীর ভক্তি রাগাত্মিকা। গোপীর এই 'রাগ' জন্মসিদ্ধ, সাধনলব্ধ নহে : "শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা" (চণ্ডীদাস)। যে প্রেমে ভক্তহৃদয়ে পরম দুঃখও সুখরূপে ব্যঞ্জনা লাভ করে, সেই পরিণত প্রেমের নাম রাগ। চণ্ডীদাসের রাধার -

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।"

এই রাগের নিদর্শন। এই রাগ গোপীর কৃষ্ণভক্তির অন্তরাত্মা বলিয়া তাহার ভক্তি রাগাত্মিকা। জীবের রাগ স্বভাবজ নহে, সাধনলব্ধ। গোপী তাহার আদর্শ। - - - - -

'শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী; তাঁহার মত লোকোত্তর ভক্তের পক্ষে ইহা সম্ভব। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধারণের ভজনা প্রকৃতপক্ষে গোপী-ভাবের; রাধাভাবের নহে - - - - -।

অন্যভাবের বিচারে বলিতে হয় যে, নিখিল ভক্তের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতীক এবং মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধা। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখী আরাধিকা রাধিকার ভক্তিমুখী বিচিত্র চিত্তবৃত্তিরই মূর্তিমান বিগ্রহ, শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ'।"...

মধুর রস বিলসিত হ'ল পদাবলীতে যেমন তেমনই মধুর বিলসিত হয়েছে জীবনীগ্রন্থেও। আশ্চর্যভাবে দুই অত্যন্ত ইতিহাসনিষ্ঠ চৈতন্যভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মাধুর্যাস্বাদ করিয়েছেন। পরতে পরতে তাঁরা রসাস্বাদকেই অভিপ্রায় করেছেন এবং প্রেমভক্তিরসাস্বাদের সামগ্রিক ফললাভে সচেতন হওয়া সমাজকেও অঙ্কন করেছেন। বিপরীতভাবে কবির দ্বারাই সর্বতোভাবে সর্বজনহৃদয়ে রসলালিত্য প্রবিষ্ট করানো সম্ভব। রূপগোস্বামীর নাট্যপ্রসঙ্গে তাই মহাপ্রভু যা বলেছেন তা সব শ্রেষ্ঠ কবির জন্য উচ্চার্য। - শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন তার পুনরাবৃত্তি — 'ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার।'[২]

বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে রমাকান্ত চক্রবর্তী বলছেন : 'মনসা, চণ্ডী, ধর্ম এই তিনটি ছিল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কাল্ট। ... হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্ম ছিলেন লোকস্তরে বুদ্ধাবতার। ... আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, ধর্মের উপাসনা ছিল আদিম সূর্যোপাসনা। ধর্মকে গ্রামাঞ্চলের আরক্ষক দেবতারূপেও দেখা যেতে পারে ...।" শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গীতার শ্লোকের অনুবাদে ধর্মরক্ষক বলে প্রভুকে বোঝাচ্ছেন। কৃষ্ণ সেই প্রভু, তারক, বৈষ্ণবের কাছে চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার। শ্রীচৈতন্যভাগবতে গীতার শ্লোকের অর্থ পাই এরূপ —

"ধর্ম্মপরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রভাবতা বাড়ে দিনে দিনে ।।
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট - বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায়ে করেন বিজ্ঞাপনে ।।
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ।।" [৩] (আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়)

ঈশ্বরের যুগাবতার যুগসন্ধিতে সমাজত্রাতা বা সমাজরক্ষক। ধর্মপথ মধুর হ'লে তা সর্বজনসাধ্য হবে। এ হেন সমাজ মানুষের গুণেই উৎকর্ষ লাভ করে থাকে। মনু বলেছেন যে, ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, পরস্বহরণে অপ্রবৃত্তি, দেহ ও মনের শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সদসৎবোধ, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যভাষণ ও ক্রোধশূন্যতা ধর্মের এই দশটি লক্ষণ। ধর্মগুণ রক্ষা করতেও আবির্ভূত ভগবান, যিনি অন্যত্র 'ধর্ম' হলেও বৈষ্ণবের কাছে 'কৃষ্ণ'। সমাজকে কলুষমুক্ত করার সময় শ্রীচৈতন্য প্রকাশ করলেন ঈশ্বরের হ্লাদিনী বা আনন্দ-শক্তির কথা। আনন্দকে বলা যেতে পারে নির্মল সুখ। ঐশ্বর্যগুণ এই উপলব্ধি জাগায় যে তা অনেকক্ষেত্রেই মালিন্য, দুঃখ বা রিপু বা অধর্ম উৎসাদনের বিরোধী। আমরা প্রভুকে চাই সে সুখদায়ী প্রভুরূপে। ভূপতি, শাসক, জমিদার, এঁরাও যেন ঐশ্বর্য ব্যক্ত না করেন, বরং গোপন করেন — এই শিক্ষা সমাজ সংগঠনের চিরকালীন মূল্যের মধ্যে অন্যতম। স্বর্গীয়ভাব নয়, নীতিবেত্তাও নয়, যাঁর ঐশ্বর্য আছে তাঁর দীনহীনের প্রতিও হবে দাসত্বভাব। মধুর প্রেমশক্তি বিলাসের সহজতম উপযোগ ত্রাতা ঈশ্বরের আদর্শে প্রাণিত হওয়াই বলে মনে হয়। যাদুবিন্দুর গানে মেলে প্রত্যয়—

"মেলে তায় খুঁজলে আপনার দেহ-মন্দিরে।
ও সেই জগৎপিতা কচ্ছে কথা
অতি মিষ্ট মধুর স্বরে।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই চিত্র —

'সঙ্কীর্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন'।।[৪]

শুধু তাই নয় সদা ঐশ্বর্য প্রবণতা আর বিষয়রস প্রাকৃতদেহে একই। বিষয়চিন্তা ও দাস্যভাব পরস্পর বিরোধী। এমনকি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত উপদেশ -

'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন-ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি—কুলাদি-বিচার ।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান"।।[৫]

সমাজে নানা ভেদ সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করলে ভেদাভেদ দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন মহামানবরা। শ্রীচৈতন্যও সেই প্রয়াস করলেন। কিন্তু সহজে একটি অবস্থার বদল হয় না। শ্রীচৈতন্য বিশ্বাস করেছেন এবং স্বয়ং আচরণও করেছেন ভক্তভাবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে (আদিলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ)

"যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।।
আপনে করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনে আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে।।
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এইও সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।।"[৬]

জীব এখানে মানুষ। মানুষকে আপন স্বরূপে ধরে রাখে ধর্ম। চারভাব ভক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হল ওপরের উদ্ধৃতিতে। এই চারভাব — 'দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার ১৭শ পরিচ্ছেদে রাধা ও গোপীর প্রিয়তম কৃষ্ণকে দ্বিভুজে অবস্থিতি করানোর মধ্যে সেই ঐশ্বর্য আচ্ছাদনই রয়েছে। শুধু তাই নয় মানবরূপের সদৃশ এই কৃষ্ণরূপই মধুর। মানবসমাজধর্মের রক্ষা করতেও তিনি প্রভু, সখা, পুত্র বা প্রণয়ীরূপেই সংস্থিত। দাস্য অপেক্ষা সখ্য মধুর — সর্বাপেক্ষা ভাবাতিশয্যে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার। এখন অনুভূত হয় যে রাধা বা আনন্দের প্রেরণায় কৃষ্ণ প্রেমকামক্রীড়াতেও আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের কথিত দ্বিভুজ স্বভাব কি মানবতুল্য স্বভাবে গণ্য হতে একেবারেই পারে না? —

"কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া ।।
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে ইহোঁ নারায়ণ মূর্তি।
এত বলি সভে তাঁরে করে নতি স্তুতি ।।
নমো নারায়ণ দেব! করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোর ঘুচাহ বিষাদ ।।
- - - - - - - - - - - - - - - -
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ।।
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে ।।
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ — নারিল রাখিতে ।।
রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব।।"[৭]

(আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ)

'মেঘশ্যামল' মনোহারী কোমলতা সত্ত্বেও চতুর্ভুজ স্বরূপে তিনি দূরে, কিন্তু দ্বিভুজে তিনি পরম আপন। কৃষ্ণকে দ্বিভুজরূপে লক্ষ করে বিষাদ ক্ষোভ সংকীর্ণতা দূর করা সহজ হয়। এছাড়া পূজা আচার শাস্ত্রের বাধ্যবাধকতা প্রায় শিথিল হয়ে যায়। সেবা হয় মধুর অর্থাৎ সহজ সুলভ। সর্বজনের পথে ঈশ্বরলাভ ধর্মলাভ ইত্যাদির যেসব অন্তরায় সুবিধাবাদী স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজ তৈরি করে তা নিশ্চিহ্ন হয়। অতিদীন দুর্বলের পক্ষে চতুর্ভুজ নারায়ণের স্কন্ধে আরোহণ করা কল্পনীয়, অথচ দ্বিভুজ কৃষ্ণের সখাকে শুদ্ধ সখ্যে স্কন্ধে আরোহন করানো খেলা, ভ্রম নয়। খোলাবেচা শ্রীধরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য প্রণয়কলহ করেন, তার লৌহপাত্র থেকে জল খান, তাকেও ভাবসম্পদ দান করেন। অকৃপণ বাধাহীন প্রেম সম্পর্কের আনুকূল্য সংস্কারের ঔদার্য বৃদ্ধি করে। নিষেধ বা মানা তো প্রায় নেই তাই এর মাধুর্য সর্বসাধারণের ভোগ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস রহস্য করে বলছেন —

"সহজে শর্করা মিষ্ট সর্বজনে জানে।
কেহ তিক্ত বাসে জিহ্বাদোষের কারণে ।।
জিহ্বার সে দোষ শর্করার দোষ নাঞি।
এইমত সর্বমিষ্ট চৈতন্য গোমাঞি।।"[৮]

ইহলৌকিক ব্যবহার রসেই তখন প্রধানত লোকসাধারণ নিমগ্ন। তখন সেই লোকসাধারণ শ্রীচৈতন্যের এই আত্মলোপ তথা দেহধর্ম-গৃহধর্ম বিস্মরণ কিংবা খেটে খাওয়া মানুষের ভাবুকতা মেনে নিতে যে বাধা পাবে সেই তো স্বাভাবিক। নরহরি সরকারের পদে কথিত — সেও শ্রীচৈতন্য মহিমা কথন —

'মধুর বৃন্দাবিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতীভাবের ভকতি
শকতি হইত কার" [৭]

তিনি সেহেন প্রেমভক্তি ভাবামোদে মাতোয়ারা করে তুললেন জ্ঞানী-মূর্খ, ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীন, ধনী-দরিদ্র, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকে। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন ভাব গ্রহণ করে এবং বিষহরি পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গীতপাঠ, পুত্রকন্যার বিবাহে অর্থব্যয়ের আমোদপূর্ণ যান্ত্রিক জীবনে ভিন্ন ভাবদর্শন করে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের মতে,

"পক্ষ যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়"।।[৯] (আদিখণ্ড, ১৪শ অধ্যায়)

অন্ততঃ যে পথ শ্রীচৈতন্য দেখালেন সে পথ নিরন্তর চাহিদার অলাতচক্রের পিষ্ট পথ নয়। অল্পে সন্তুষ্টির মধ্যম মার্গ। মধুরের স্পর্শ হিংসামুক্ত, লোভমুক্ত একটি পরমার্থলাভের আবেগকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সমস্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত রক্ষণশীলতা আদতে সমাজে বদ্ধতা আনে। সেখানে উচ্চকোটির কার্যত আগ্রাসী প্রাধান্য চলে। এই কঠোরতা মানুষের ধর্মবিশ্বাসই শুধু নষ্ট করে না, মানুষে মানুষে বিশ্বাস ও এমনকি আত্মবিশ্বাসও হ্রাস করে। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের এই বিশ্লেষণ পড়লে বোঝা যায় মাধুর্যের শক্তিতে শ্রীচৈতন্য এ হেন রক্ষণশীলদের পরাক্রমে প্রবল আঘাত করতে পেরেছিলেন। সমাজে একটি ঐক্যবিধায়িনীরূপে ভক্তিসূত্রকে কাজে লাগিয়েছিলেন যুক্তিবাদী শ্রীচৈতন্য। ক্ষিতিমোহন সেনের সাধক ও সাধনা গ্রন্থের 'দোলদুলাল শ্রীচৈতন্য' প্রবন্ধ থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

- "প্রাকৃত ও শাস্ত্রীয় এই দুইটি ভাগবত ধারা বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া সমান্তরালভাবে চিরদিন বহিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কখনও তাহা পরস্পরে যুক্ত হয় নাই। অদ্বৈতাচার্য ছিলেন শাস্ত্রনিষ্ঠ, নিত্যানন্দ ছিলেন প্রাকৃতভাবের লোক, ভাব-ঐশ্বর্যে ভরপুর।

মহাপ্রভু তাঁহার অপূর্ব-নিষ্ঠা ও প্রেমভক্তির বলে এই দুই ধারাকে যুক্ত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-নিত্যানন্দের যুক্তবেণীতে মহাপ্রভু এই বাংলাদেশকে ভাসাইয়া দিলেন। এই যে অপরাজেয় ভাবের বন্যা তাহা মহাপ্রভুর আপন বস্তু।" ...[৯]

প্রবলকে ভয়ভক্তি করার ভুল শিক্ষা আমাদের অনেকেরই আছে। সকলেই এও জানি যে প্রবলের পীড়নের প্রতিকার করা দুর্বলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য দুর্বলকে সঙ্গে রেখে প্রবলের পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। বিবাদ-কুৎসা নিশ্চয়ই মাধুর্য নয়। তা সব নিষেধ হ'ল। যে সব পাষণ্ডী-নিন্দুক এককালে বৈষ্ণব নিন্দন' করেছিলেন, তাঁদের বৈষ্ণব-বন্দনে' নিযুক্ত করাও সম্ভব হয়েছিল। মধুর লীলা সংকীর্তনের একটি গণ তৈরি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাত্রিকালে নিদ্রাগত সুখী মানুষের নিদ্রার ব্যাঘাত করেই শচী নন্দন শ্রীবাসগৃহে নৃত্য ও কীর্তন করতেন। এই সমস্তই প্রবলের পরাক্রমের বিরুদ্ধে মধুরবাদী গণ সংগঠন। হিংসা না করে সচ্ছল ধনীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে গণভাবের চেতনাকে অনুধাবন করতে।

শিষ্ট সমাজের লক্ষণ নয় শক্তিমানকে ধর্মশক্তি দিয়ে চ্যালেঞ্জ। প্রবলের দ্বারে অথচ স্বয়ং চৈতন্য করাঘাত করেছিলেন প্রবলতর সে করাঘাত। আত্মসুখী কতিপয় ব্যক্তির আত্মসুখ ধর্মকে শ্রীচৈতন্য পাষণ্ডের কর্ম বলে দেখিয়েছেন। আপন পর ভেদ জ্ঞান যাঁদের নেই তাঁদেরই আদর্শ করা উচিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে সেই বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসার আকারে আনীত হয়েছে। যশোদানন্দনই হয়ে উঠেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, সে বাৎসল্যগুণে। চৈতন্যভাগবতকার আদিখণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখেছেন —

"পরম অদ্ভুত কথা কহিলে গোমাঞি।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই ।।
নিজ পুত্র হৈতে পরতনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ হৈল কেমন প্রকারে।।" [১০]

শ্রীচৈতন্য বাল্যকাল থেকেই চমৎকৃত করে অনিচ্ছুকের মনও কোনোভাবে নিজের প্রতি আকর্ষিত করেছেন। বাল্যকালে নিমাইয়ের দুষ্টামিও আনন্দ দিয়েছে। তার ফল বর্ণিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে —

"দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ সবে করেন পিরিত।।
নিজ পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্বচিত্তবিত্ত হরে।।" [১১]

বৃন্দাবনদাস বলেছেন — 'অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ বহি নাহি আর' ১২ (আদিখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

কামুক ব্যাভিচারী ব্যক্তিরও অভাব নেই কোন সমাজেই। অতএব রসস্নিগ্ধ শ্রীচৈতন্য তাঁদেরও নির্দিষ্ট আয়তনে হানা দিয়ে উপভোগের হার্দ্য পথ বাতলেছেন। মদ্যপকে দেখিয়েছেন প্রাকৃত মদিরা ক্ষণিক, তা দীর্ঘজীবী সুধা নয়। একটি বিশাল দলকে শ্রীচৈতন্য নিজ পক্ষে এনেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে মধুর ধর্ম বিঘ্ন নাশ করে। শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতিই নয়, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিঘ্নও সংঘজীবীরা এবং স্বার্থহীনরা নাশ করতে পারেন। ভক্তগণ নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনার চিত্র এমনই মধুর। শারীরিক চাহিদা মেটানো অপরাধ নয়, কিন্তু মানসিক চাহিদা দিয়ে শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা তাও অতিমানবীয় কিছু তো নয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের নিন্দুকদের মতও সাগ্রহে প্রচার করেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের নানা সভক্তি অভিব্যক্তি বর্ষণকে সকলেই সমকালে প্রশংসা করেননি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হয়েছে ক্ষোভ —

"সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ — করে সংকীর্তন।।
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে।।" [১৩]

একদিকে অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত ভাবও সকলের সয়না, অন্যদিকে নাচ-গান-নাটক-কীর্তন বিলাসও বহুজনের রুচিকর নাও হতে পারে। বিশেষত সর্বজনসমক্ষে যখন এই কীর্তন ও গান প্রভৃতি চলেছে। ভক্তেরা তাঁর সাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্য করতে পেরে অভিভূত হতেন, কিন্তু অনেকের কাছেই এহেন উচ্চকিত প্রেম উন্মত্ততার নামান্তর। তথাপি এহেন দৃশ্য দেখে সামাজিক তিক্ততা প্রশমিত হল। এখানেও মাধুর্যভাব পর্যবেক্ষণের কার্যবিধি। সূক্ষ্মভাবে যদি দেখা যায় তো বৈধী ভক্তির নিয়ন্ত্রণকে শ্রীচৈতন্য যে রাগানুগা প্রচার করে ভেঙ্গে ফেলেছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আগেই চণ্ডিদাস কটাক্ষ করেছিলেন যে —

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিকে গোটিক হয়।।"

কিন্তু জগতে মানবদেহ ধারণ করিয়া নিশ্ছিদ্র অরসিক কেউ নেই, তাই নিম্নলিখিত ভাবগূঢ় কআপাত-দুর্বোধ্য পদটির ভিতরকার রহস্যরস দুর্নিবার শক্তিতে আমাদের আকৃষ্ট করে :—

"মরম না জানে/ধরম বাখানে/এমন আছয়ে যারা/কাজ নাই সখি/তাদের কথায়/বাহিরে রহুন তারা।" — তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার জানান — "প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।/ অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়"[১৪]

ভক্তির মাধুর্যে ভক্তমধ্যে ভগবান ভাজিত হয়ে যান। সেখানে ঘৃণা নেই। সনাতনের ঘা পুঁজ হয়েছে তবু শ্রীচৈতন্য তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু উত্তরও দিয়েছেন মধুর। "মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়/ঘৃণা নাহি উপজয় আরো সুখ পায়/লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়।/সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায়" [১৫]

এই মানবপ্রেমের পর বলা যায় না যে শ্রীচৈতন্যের মধুর ধর্ম মানুষকে শুধু দৃশ্যসুন্দর দিয়ে সম্মোহিত করেছিল। হৃদয়াবেগের শক্তিতে সমাজে একটি ঘূর্ণাবর্তই বরং সৃষ্টি করেছিল যে ঘূর্ণাবর্ত ধর্মশক্তির আবাহনকে ওলট পালট করে দিয়ে ক্ষমতালোভীদের বা ধর্মব্যবসায়ীদের সাময়িক হলেও পরাস্ত করেছিল।

পার্থিব প্রয়োজন অপ্রয়োজনের মধ্যে সাধারণ মানুষ প্রভূত পার্থক্য করেন। অথচ অনুরাগে সেরূপ হবার কথা নয়। যশ-খ্যাতি, শক্তি-কীর্তি, বিক্রম-সম্পদ আদর্শ নয়। প্রেম কিন্তু আদর্শ। মদ, কাম, মাৎসর্য এমনকি ক্রোধও প্রেমের উন্মেষে ক্ষয় হয়। শুরু হল নামকরা থেকে। পদাবলীকার জানাচ্ছেন যে নাম জপ করতে করতেই শ্রীরাধা অবশতনু, অথবা বলছেন যে এই নাম তাঁর মর্মে প্রবিষ্ট হয়েছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই অবস্থা সূর্যোদয়ের মতো সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্ট হয়েছে। আদর্শের প্রতি অগ্রসর হবার চিহ্ন —

"হরিদাস কহে যৈছে সূর্যের উদয়।
উদয় না হইতে তমের হয় ক্ষয় ।।
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয় ত্রাস
উদয় হইলে ধর্ম-কর্ম মঙ্গলপ্রকাশ।।" [১৬]

(অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ)

সমস্ত অস্পষ্ট দিগ্‌দেশ ধরা যাক সূর্যোদয়ে আলোকিত হচ্ছে। যে সমস্ত বিচিত্র ভাব ও ভাবনাকে মানুষ গতানুগতিক ঠাঁইতে অদরকারির কোঠায় ফেলে রেখেছিল আজ তাই মনকে প্রফুল্ল করেছে। দশজনকে জাগিয়ে তুলেছে। আবার পদাবলীকারের প্রসঙ্গ তুললে বোঝা যায় যে ঈশ্বরস্পর্শে অবিমিশ্র সুখ কেননা গুরুর নাম মাধ্যমেও হৃদয় অনুরঞ্জিত হবার আনন্দ পেয়েছে। একদা তো এই নামগান মানবের কাম্য ছিল না। প্রখর বস্তুবাদ বা জড়বাদে অপ্রয়োজনের ব্যাপ্তি ছিল না, কঠোর বাস্তবকেই সমাজ জানে সত্য বলে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে অপার লীলা অদ্ভুত অকারণ অবারণ এবং তুলনামূলকভাবে একটি অধিক স্বাধীনতা চক্ষুরুন্মীলনে সহায়তা দিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

"গোপীগণের শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন ।।
সর্বোত্তম ভজন ইহার সর্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তোমার ঋণী।।" [১৭] (অন্ত্যলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ)

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাববিলাস জীবের প্রেমকে অভিনন্দিত করতে শেখায়। ইতিপূর্বে এই ভাব ছিল না। মধুরের এই সাম্রাজ্যবিস্তার করেছেন শ্রীচৈতন্য। কঠোর তপশ্চর্যা বা ক্লেশভোগও সুচির নয়, যদিও তাতে পার্থিব কামনা সিদ্ধ হয়, ধর্ম-মোক্ষও লাভ হয়। অপার্থিব প্রেমের জন্য এহেন শিক্ষা বিষ থেকে বিষক্ষয়ের। এখানে অহেতুক ক্লেশভোগ। বিরহ থেকে জন্মানো ক্লেশ। ক্লেশভোগেই আনন্দ, তাতেই প্রেমের গাঢ়তার স্ফূরণ। মুক্তির লোভেরও বশবর্তী করা যাবে না কৃষ্ণভক্ত এমনই অটল। ভোগবাদীকে ইঙ্গিত করেই কৃষ্ণদাস বলেন নি কি নীচের কথাগুলি? মধুরে নিশ্চয় করা আনন্দ বৈচিত্রীর সন্ধানও—

"মুক্তি-ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি।।
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।।" [১৮] (মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ)

আর শক্তির লোভে অপদেবতার তুষ্টি, যাদুমন্ত্র, বলি, অভিচারাদি ক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজনও প্রাকৃত জগতে একইপ্রকার রইল না।

সমাজে নারীজাগরণেও মধুর ভাব বিলাসের অবদান লক্ষ্য করা গেল। দাস্য-দৈন্য-কৃষ্ণ সেবা — দেহ দিয়ে কৃষ্ণসেবা — এততেও শেষ রক্ষা কিন্তু হ'ল না। মূঢ়ব্যক্তি দেখে শ্রীরাধার প্রাণনাথ সমস্ত রসের আশ্রয় রাধাকে কখন ত্যাগ করে চলে গেছেন মথুরায়। পরকীয়া প্রেমে সংশয় থাকলেও তাতেই যে নারীর প্রেম সর্বাপেক্ষা 'সমর্থা' রূপে দেখা দিয়েছে তাও মানতে আমরা বাধ্য হই। যেমন রাধা পারলেন এমন কেউ পারলেন না। ভুল বশে রাধার বিরহে মানবিকভাবে আলোড়িত হলেই সঙ্গে সঙ্গে সত্য কথা বার হয়ে আসে যে

"মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইঞা
শূন্য মোর শরীর আলয়।।" [১৯]

(অন্ত্যলীলা, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ) চৈতন্যচরিতামৃত

প্রভু শ্রীচৈতন্যের এই দশ দশা চিন্তা জাগরণাদি, যার পরিণামে ব্যাধি উন্মাদ মোহ ও মৃত্যু। কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি রাধারও সেইরূপ। বিদ্যাপতি অবশ্য দেখিয়েছেন 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।'

রাধার বঞ্চনার কথাও ইহলৌকিক কবিতায় পঞ্চমুখে ব্যক্ত। নারীর প্রিয়তমের প্রতি অদেয় কিছু ছিল না অথবা থাকে না। তবে তার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। শুধু চণ্ডিদাসই একা নারীর সামাজিক মনটিকে চেনাবার কাজ করলেন তাই নয়। শ্রীচৈতন্য নারীর সামাজিক অসহায়তাকে অস্পষ্ট রাখলেন না। নারীভাবে সেবা না করিলে যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা কঠিন হয় তাহা পশ্চিমের মিস্টিক সাধকেরাও অনুভব করিয়াছেন। F.W. Newman লিখিয়াছেন — 'If the soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman" ... বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁর পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'র ভূমিকায় বলেছেন। নারীর স্বার্থত্যাগ, নারীর দুঃখভোগ আদর্শের নমুনা। কিন্তু নারীই কেন নমুনা, পুরুষ কেন নয়? নারী দম্ভী হবেনই না তাও নয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে নারীই কামকে প্রেমে পরিণত করে দেখায়। - অধিকাংশ নারীই যেহেতু একটি সমাজে ক্লিষ্ট পিষ্ট—তাই তো এই নারীভাবের অঙ্গীকার। নারীর দৈন্য স্বতঃসিদ্ধ,

'না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য।।" [২০]

সখীপ্রেম এমন মধু নিষ্যন্দী যে তাঁরা কৃষ্ণ-রাধা লীলায় আপন কেলির চেয়ে কোটিগুণ সুখী হয়।পুরুষই যেখানে প্রভু সেখানে কামিনীকে মহাভাবস্বরূপিনী বলে প্রেমার পরিণাম দেখালেন শ্রীচৈতন্য। মাধুর্যের এই পরকাষ্ঠা। বহুবল্লভ কৃষ্ণ পুরুষপ্রাধান্যের সমাজে পুরুষ মাহাত্ম্যের কথা বললেনই না। পুরুষোত্তমের সমস্ত সহানুভূতি নারীর পক্ষে টেনে আনার জন্যই তাঁর লীলা বলে মনে হয়।

শুষ্ক বৈরাগ্যকে চৈতন্য কখনও প্রধান মার্গ বলে ভাবেন নি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা ২৩শ) আছে যে —

'যুক্ত বৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল।।" [২১]

'শ্রীকৃষ্ণ' অধ্যায়ে ভারতপরিক্রমার লেখক ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন :-'যে সাধক যুক্তাহারবিহার, যে সকল কর্মে যুক্তচেষ্ট, যাহার যুক্ত নিদ্রা ও জাগরণ, যোগ তাহারই সকল দুঃখ দূর করে।" শ্রীচৈতন্যের মধুর যোগের একই ক্রম। প্রেম যে ভোগ বা উপভোগ করা যায় না তাও লিখেছেন চৈতন্যচরিতকাররা। চৈতন্য সন্ন্যাস নিয়েও শেষ কথা বলার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং দেখা গেছে যে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৫শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে —

"করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে
বলি অট্ট অট্ট হাসে' সর্ব-লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভা'ত।।" [২২]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদেও দেখা গেছে সন্ন্যাস প্রসঙ্গে মাতাকে দূরে রাখায় চৈতন্যের খেদোক্তি —

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ।।" [২৩]

সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ঘটনা ছোট হরিদাসকে ত্যাগ ও তাঁর আত্মবিসর্জন। অপরাধ সন্ন্যাসীর প্রকৃতিদর্শন এবং তার বিষয়গ্রহণ যা কিনা তণ্ডুলমাত্র। সন্ন্যাসের জন্যই এই গুরুদণ্ড। একথা সত্য যে তিনি গ্রাম্যবার্তা বলতে ও শুনতে নিষেধ করেছিলেন, অমানীকে মান দিয়ে গর্ব দূর করার অভ্যাস করিয়েছেন, ভাল খেতে ভাল পরতে বারণ করেছেন কিন্তু নিরম্বু উপবাস করতেও কখনও বলেন নি। মহাপ্রসাদ, ভিক্ষাগ্রহণকালে তিনিও তাঁর গণ বহুবিধ ভক্তের পাক করা দ্রব্য ভক্ষণ করেছেন, মাল্য ও চন্দনে ভক্তগণকে বারবার ভূষিত করেছেন। চৈতন্যের মধুর বাসনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দদায়ী বোধের মাধ্যমে পবিত্রতার তীর্থ গড়ে তোলা। তীর্থই তাঁর স্বর্গ।

পরবর্তীকালে সর্বদা মানুষের কাছে এই ভক্তি আন্দোলন সেই রকম মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ থাকে নি। তবে কোন কোন আধুনিক বাংলা কবিতায়-নাটকে প্রেমহীনতা, পুরুষ নির্দয়তা, নিষ্করুণ বৈরাগ্য হৃদয়বাদীর সংকটের ছবি আঁকা হয়। আধুনিক কালে বিজ্ঞানচেতনা, বস্তুসত্য, লৌকিক প্রাধান্যের মধ্যেও মানব হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। কবি জীবনানন্দ দাশের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় লক্ষ্য করা যায় যুগের সুবেদী মনের বিনষ্টির ক্ষতি —"যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই — প্রীতি নেই — করুণার আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"

'অপ্রেম ও প্রেম' কাব্যগ্রন্থ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের। ঐ গ্রন্থের নামকবিতায় দ্বিবিধ টান —

"হৃদয় আকাশ হয়ে আছে
কোনো এক মৃত প্রেম ভুলে যাই পাছে।"

রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটকের 'রথের রশি' অংশে রথ স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৪শ পরিচ্ছেদেও এমন হয়েছিল দেখা যাচ্ছে —

'মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে।।'[২৪]

রবীন্দ্রনাটকে শূদ্ররা সেই রথের দড়ি ধরে টানলে রথ চললো। প্রাক্কালেও শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্যের সাধারণগণই রথ সচল করেছিলেন। দুই ক্ষেত্রেই ভালবাসার শক্তির জয়গান এবং সেই শক্তি উপলব্ধ করানো। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে বলা হ'ল

'শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার।।'[২৫]

লালন বললেন — "শূন্যদেশে হয় মেঘের উদয়।
নীরদবিন্দু বারি বরিষণ তায়
ফলছে কত ফল রঙ বেরঙের হল
আজব কুদরতি ফল ভাবের ঘরে।।"

রবীন্দ্রনাথ কালের যাত্রায় সমাজ প্রসঙ্গ অস্বীকার করলেন না। 'কবি' চরিত্র বলেছেন —

"ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন —
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।"

নতুন সময়ে সময়ে নবায়িত হয়েছে প্রেমের ঠাকুর ও প্রেমের পাত্ররা, অভিস্নাত হয়েছে ভাবহীনেরা ভাবরসে। মানবধর্মের চলনে অতীত ও ভাবীর মূল পন্থা মাধুর্যে লব্ধ হয়েছে। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। ভাবপ্রাধান্যের মাধুর্য বিতর্কের অতীত নয়, কিন্তু এই পর্যালোচনা মানবের মানসিক সুখ পূর্ণতা তো অস্বীকার করা যায় না। পদাবলীকার বলেছিলেন — "নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি ভাবিনী ভাবের দেহা "

দীনেশ চন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যা নির্ধারণ করেছেন তাই এই প্রবন্ধের উপসংহাররূপে উদ্ধৃত হলো :

"ষোড়শ শতাব্দী ছিল ভারতের শাস্ত্রচর্চার যুগ — এই যুগে প্রতিষ্ঠা পাইতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তিনি দেখিয়াছিলেন, "ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্যতি। জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণশ্যতি।" শাস্ত্র ভগবৎভক্তির সহায়, এজন্য শাস্ত্রের দরকার। ভগবৎভক্তি জন্মিলে শাস্ত্রের কোন দরকার থাকে না, ফলের জন্যই পুষ্পের দরকার, ফল হইলে পুষ্প আপনা আপনি ঝরিয়া পড়ে।

"মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটী নমস্কার করি তাহার চরণে।।" (গোবিন্দের কড়চা)

ইহাও চৈতন্য প্রভুর উক্তি। দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্যজাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রাপ্য মর্য্যাদা সীমাবদ্ধ নহে একথা বিনয়সহকারে কিন্তু অটল বীরত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন।"

তথ্যসূত্র ঃ

১। গৌরাঙ্গ বন্দনা — নয়নানন্দ : বৈষ্ণব পদাবলী — সুকুমার সেন সংকলিত। সাহিত্য একাদেমি। পৃ. ৩। প্রথম প্রকাশ, সপ্তম মুদ্রণ — ২০০৩।

২। শ্রীকৃষ্ণ : ভারত পরিক্রমা — ক্ষিতিমোহন সেন। পুনশ্চ। পৃ. ৬২। প্রথম প্রকাশ, ২০০৪।

৩। ধর্মস্য তত্ত্বম্ : নীতি, যুক্তি ও ধর্ম, কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ — বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। আনন্দ। পৃ. ৪১। প্রথম সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ — ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

৪। ১; ২; ৫; ৬; ৭; ১৩; ১৪; ১৫; ১৬; ১৭; ১৮; ১৯; ২০; ২১; ২৩; ২৪ ও ২৫ নং উদ্ধৃতির উৎস — শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত — শ্রী কৃষ্ণদাস বিরচিত — ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর ভূমিকা সম্বলিত ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর। পৃ. ৪৪; পৃ. ৫১৬; পৃ. ৫৩৭-৫৩৮; পৃ. ৪০; পৃ. ১৬০; পৃ. ৯৮; পৃ. ৫৪২; পৃ. ৫৪২; পৃ. ৫৩১; পৃ. ৫৬৮; পৃ. ২৫৫; পৃ. ৬০৯; পৃ. ৬৫৩; পৃ. ৪৫২; পৃ. ৬৪২; পৃ.৩১২; পৃ. ৩১৩। প্রথম সংস্করণ — ২০০৭।

৫। বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) : অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্র নাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত। পৃ. ১৮-১৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৫শ সংস্করণ — ২০০৪।

৬। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম : রমাকান্ত চক্রবর্তী। আনন্দ। পৃ. ২১। প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ — ২০১৭।

৭। ৩; ৪; ২২ নং উদ্ধৃতির উৎস — বৃহৎ শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত — শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত, দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। অক্ষয় লাইব্রেরী। পৃ. ৩৭; পৃ. ৩৪৩; পৃ.৩৭৮। পুনর্মুদ্রণ — ২০১৭।

৮। বাংলার বাউল ও বাউল গান — অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ৩২৮। ৪র্থ সংস্করণ। ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

৯। ৮ নং; ৯ নং; ১০ নং; ১১ নং ও ১২ নং উদ্ধৃতির উৎস — শ্রীচৈতন্যভাগবত — বৃন্দাবনদাস বিরচিত আদি খণ্ড, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাহিত্য সঙ্গী। পৃ.২৯; পৃ. ৯২; পৃ. ২৯; পৃ. ১৮; পৃ. ৮৫। তৃতীয় প্রকাশ — ২০১২।

১০। গৌরাঙ্গ পদাবলী — নরহরি সরকার : বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন — দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। পৃ. ১৭। ২য় প্রকাশ — ১৯৮৮।

১১। দোলদুলাল শ্রীচৈতন্য — ক্ষিতিমোহন সেন : সাধক ও সাধনা — সম্পাদক প্রণতি মুখোপাধ্যায়। পুনশ্চ। পৃ. ২৭৪-২৭৫।

১২। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি — শঙ্করীপ্রসাদ বসু : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২০।

১৩। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী — শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, জিজ্ঞাসা। পৃ. ২। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

১৪। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভারবি। পৃ. ১২৪। ২য় ভারবি সংস্করণ, ১২শ মুদ্রণ, ২০০৭।

১৫। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা — সুশান্ত বসু সম্পাদিত। ভারবি। পৃ. ৯৪।

১৬। লালনসমগ্র — আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত। পৃ. ৩০২। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা — পুনর্মুদ্রণ — ২০০৯।

১৭। রথের রশি : কালের যাত্রা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। পৃ. ৪৫। পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ — ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

১৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দীনেশচন্দ্র সেন, ১ম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ.৩০৭, ৩য় মুদ্রণ, ২০০২।